

সম্পাদকীয়

খালা বাজিয়ে, দীপ জ্বালিয়ে নব্বই দিনেও করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে জয় অধরা। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের লড়াই বেশি কঠিন। কারণ, বিজ্ঞানের বদলে আমাদের আয়ুধ অপবিজ্ঞান (গরুর গোবর/চোনায়ে করোনা সারবে), কুসংস্কার (কনোনা-দেবীর পূজা), ধর্মাত্মতা (দেবতারা বাঁচাবেন) এবং ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সবাই ‘বসে আছি পথ চেয়ে’—কবে আসবে করোনা-ভ্যাকসিন। যদিও ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের তা ক্রায়ত্ব হবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই ভরসা আপন-সাবধানতা এবং বিজ্ঞানে আস্থা। আর স্মরণে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত-দের শিক্ষা ও আদর্শকে।

জুলাই মাসের ২৯ তারিখে বিদ্যাসাগরের ১৩০-তম মৃত্যুবার্ষিকীর (২৯ জুলাই ১৮৯১ সাল) নিমিত্তা শ্মশান ঘাটে স্মৃতি ফলক বসানো হল। আমাদের সৌভাগ্য মৃত্যুর ১৩০ বছর পর অন্তত ফলক বসানো গেছে। গত কয়েক সংখ্যায় আমরা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনের চেষ্টা করেছি।

ভালো থাকবেন, ঘরে থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। সামাজিক ব্যবধান, বিধি-নিষেধ মেনে চলুন। অলমিতি বিস্তারেন।

আশার আলো দেখাচ্ছে বিজ্ঞান - বিজ্ঞানে

ভরসা রাখুন

পেলব মুখার্জি

সারা পৃথিবী জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশেও ক্রমবর্ধমান। কবে শেষ হবে কেউ জানেনা। মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, তেলঙ্গানাতেও সংক্রমিত সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গেও গড়ে উঠছে আক্রান্তের নতুন নতুন রেকর্ড।

আমাদের রাজ্যে একে তো করোনার হামলা, তার সাথে যুক্ত হয়েছে উম্পুন বা আমফান যাই বলুন। সারা রাজ্যব্যাপী আমফান ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাহাকার আর তার সাথে ডেসুর আতংক। অফিস, কাছারি, কিছু খুললেও কাজ কি হচ্ছে তা কেউ জানেনা। আবার নতুন করে বিভিন্ন containment zone-এ লক-ডাউন করতে হচ্ছে সরকারকে। ব্যবসা-বাজার অচল হয়ে পড়ছে। কল-কারখানা তো আগেই গেছে। চাষবাস করে যা হোক কিছু কাজ করছিল মানুষ তাও অচল হয়ে পড়ার যোগাড়। সিঁদুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে।

গরীব মানুষদের কথা ভাবুন। সরকারি ত্রাণই একমাত্র ভরসা। রাজ্য সরকার আগামী জুন ২২ সাল পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দেবার ব্যবস্থা করেছে। আবার তা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও

ক্রমবর্ধমান। রাজ্যে শাসকদলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আমফান রিলিফ তহনছ করার অভিযোগ, যা অভূতপূর্ব বলা যায়। ইতিমধ্যেই খবর যা বেরিয়েছে তাতে চোখ উল্টে যাবার অবস্থা, দিকে দিকে টাকা ফেরতের খবর। প্রশ্ন হলো দুর্নীতির পর টাকা ফেরত দিলেই কি সব দোষ চাপা পড়ে যাবে? সারা রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারও বিনামূল্যে রেশন দেবার কথা বলেছে। আগামী বছর রাজ্যের নির্বাচন। ইতিমধ্যে কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল নির্বাচন। সব করোনার গ্রাসে বন্ধ। সব কিছু অচল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে মানুষের চেনারও সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কোন দিকে চলছে দেশ - অপেক্ষা করা ছাড়া কি পথ নেই। পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন মানুষ। এত বিপর্যয়ের মধ্যে আশার কথা সংক্রমণ নয় বাড়ছে রোগমুক্তির খবর। ভরসার কথা বিজ্ঞানের। ইতিমধ্যেই রাশিয়া অগস্ট মাসে প্রতিষেধক বাজারে আনবে বলেছে। ভারত ও গ্রেট ব্রিটেন তৈরী হচ্ছে। আগামী বছরের মধ্যে আসবে বলে জানা গেল। জয় অনিবার্য - তবে ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর করার কি। সব বিজ্ঞানের উপর ভরসা রাখুন। জয় আসবেই। গড়ে উঠবে করোনামুক্ত পৃথিবী।

সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

আমাদের বিদ্যাসাগর (৪র্থ পর্ব)

গৌতম রায়চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্যই বিদ্যাসাগর বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বই ‘বাসুদেব-চরিত’ কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেনি বলে প্রকাশিত হয় নি। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত গ্রন্থ ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হলে বাংলা গদ্যের নতুন যুগের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সহ অনেকেই বিদ্যাসাগরকে কেবল পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা ও অনুবাদক বলেই মনে করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে—“বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। ...বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্য সর্বদা সচেতন ছিলেন।” (বিদ্যাসাগরচরিত, র. ঠাকুর) শতাধিক বছরেও বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’কে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো কোন বই বাংলা সাহিত্যে লেখা হয় নি। ‘বর্ণপরিচয়ের’ গোপাল ও রাখাল বাংলা শিশু-চরিত্রের মধ্যে অন্যতম।

আমরা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অনাবিল এবং তির্যক হাস্যরসের উল্লেখ করব। তাঁর বাল্যরচনা বা ছড়ায় আমরা হাস্যরসের উন্মেষ লক্ষ্য করি। অনবদ্য এক বাল্যরচনা, সরস্বতী পূজার পটভূমিকায় সরস সংস্কৃতে খাদ্যবন্দনা। তাঁর শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রতি বছর বিপুল সমারোহে সরস্বতী পূজা করতেন। ছাত্রেরা দুইবেলা খাওয়াদাওয়া করতেন। একবার তাঁর অনুরোধে বিদ্যাসাগরকে শ্লোক রচনা করতে হয়। ভারি মজার :—

“লুটী কচুরী মতিচূর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিয়াজিতম্।
যস্যঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্তমঃ
সরস্বতী সা জয়তাল্লিরন্তরম্॥”

(বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৪র্থ, পৃ. ৩২২)

বিদ্যাসাগর খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বিহারীলাল সরকারের বর্ণনা—“স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ানো তাঁহার শখ ছিল। খাওয়াইতে বসিয়া প্রায়ই প্রীতিপ্রফুল্লতা ভরে বলিতেন :

হঁ হঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ং করকম্পনে
শিরশি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রকম্পনে॥”

(শঙ্করী প্রসাদ বসু, পৃ. ১০৩)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস শ্রেষ্ঠ। বেতালপঞ্চবিংশতি-তে প্রেতলোকের বর্ণনায় পরলোকে উদাসীন বিদ্যাসাগরের তির্যক হাস্য ভঙ্গিমা আমাদের নজর টানে। আমরা বইগুলির বিজ্ঞাপনে, যা বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা, wit বা উচ্চাঙ্গের রসিকতা খুঁজে পাই। শকুন্তলার বিজ্ঞাপন—“...বস্তুতঃ বাংলায় এই উপাখ্যানের সংকলন করিয়া আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।” ২৫এ অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১১। শ্রীশ্রীচন্দ্র শর্মা” (রচনাবলী পৃ. ১২১) বিদ্যাসাগর কালিদাসের মূল নাটকের কিছু বর্জন করেছেন, কিছু সংযোজন করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছ ও রসবাহী এবং বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞাপনে আমরা আত্মপ্রচারে অভ্যস্ত, আর বিদ্যাসাগর আত্মগোপনে ব্যস্ত।

‘ভ্রান্তিবিলাস’, শেক্সপিয়রের The Comedy of Errors-এর নবরূপায়ণ। বিদ্যাসাগর স্থান ও পাত্রপাত্রীর নামের পরিবর্তন সাধন করেছেন কিন্তু এতে হাস্যরসের বিন্দুমাত্র হানি হয় নি। বস্তুত এটি বাংলায় শেক্সপিয়রের একটি শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। তাঁর মতো সংস্কৃত পণ্ডিত কী ভাবে হাস্যরসের ফল্গুধারা বইয়ে দিল তা ভাবতে অবাক লাগে। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, “ভ্রান্তিপ্রহসন, কাব্যংশে, শেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকবহ।” (শঙ্করী প্রসাদ বসু, পৃ. ১০৩)

চণ্ডীচরণ লিখেছেন—“ইহাতে উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আছে, কিন্তু মলিনতা নাই, গোপাল ভাঁড়ের রহস্য আছে, কিন্তু ভাঁড়মি নাই।”

(চণ্ডীচরণ, পৃ. ১১৮)

আবার ‘কথামালা’য় বিদ্যাসাগর সহজ, সরল ভাষায় হাসির সঙ্গে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। বিজ্ঞাপনে (১৮৫৮ সাল) তিনি লিখেছেন,— “গল্পগুলি অতি মনোহর। পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।” কথামালার বিভিন্ন অংশ বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। যেমন, “একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল”, প্রভৃতি।

১৮৫৫ সালেই বহু বিবাহ রদ করার দাবিতে ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত এক আবেদনে বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রথমে রাজি হলেও সিপাহি বিদ্রোহের ফলে সরকার আর সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় নি। ১৮৭১ সালে আগস্ট মাসে তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবিতে “বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার” প্রকাশ করেন। বিতর্কের ঝড় উঠলে, বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মত খণ্ডন করে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে “বহুবিবাহ রহিত উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার” নামে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। প্রতিপক্ষেরা তখনও ক্লান্ত হয় নি। বিদ্যাসাগর তখন বেনামে পাঁচটি পুস্তক রচনা করে প্রতিবাদীদের জবাব দেন। সেগুলো হল : ‘অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ‘আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), বিধবাবিবাহ ও যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪) এবং ‘রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)। বেনামী হলেও এ গুলো যে বিদ্যাসাগরের রচিত তা বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই পাঁচখানি বই মজলিশী মেজাজে, হাল্কা চালে লেখা হলেও, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেয়। খাঁটি সোনায়ে যেমন গয়না হয় না, খাদ মেশাতে হয়, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে রঙ্গ-ব্যাঙ্গ মিশেছে। বহু বিবাহ সংক্রান্ত লেখায়,

‘অতি অল্প হইল’ এবং আবার অতি অল্প হইল’, তিনি প্রতিবাদীদের সমালোচনা করার সময় ধৈর্য হারিয়ে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, এমন অভিযোগ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে প্রকাশিত রচনার মাধ্যমে। কিন্তু অপকর্মের প্রতিবাদ করার জন্য বিশেষত সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য চড়া ঠাট্টা-তামাসা বা গালমন্দের প্রয়োজন ছিল। স্বনামে লেখা চলে না বলেই বিদ্যাসাগর ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের পরিহাসপ্রিয়তা যদি কখনো স্থূল মনে হয়, তবে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। “এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড় ভট্টাচার্যের মত প্রমেতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য। এরূপ উচ্চ অপের রসিকতা বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আছে।” প্রমথনাথ বিশী বলেছেন “...বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ wit তিনি।মজলিশী মেজাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শ্লেষচাতুর্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের সমবায়ে এগুলি রচিত।” (করণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩১, ৩৩২)

‘অতি অল্প হইল’, ‘আবার অতি অল্প হইল’, ‘ব্রজবিলাস’ ও ‘রত্নপরীক্ষা’ থেকে কয়েকটি অসাধারণ হাস্যমধুর অংশ তুলে দিচ্ছি।

“এক কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ডুর।
হতদশ হইল বাচস্পতি বাহাদুর ॥ ১ ॥

তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন ॥ ৫ ॥

(অতি অল্প হইল)

টাকার অভাবে খাজনা দেওয়া যাচ্ছে না। জমিদার উদ্বিগ্ন হয়ে দেওয়ানকে ডাকিলে, তিনি ভরসা দিলেন। কিন্তু খাজনা জমা হল না, জমিদারি লাটবন্দী হল, তখনও দেওয়ান অভয় দিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলাম হয়ে গেল। “নিলামের সংবাদ শুনিয়া বিষম ও বিস্ময়াপন্ন

হইয়া জমিদার দেওয়ানজিকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন, “তুমি, পূর্বাপর ভরসা দিয়া, অবশেষে আমার সর্বনাশ করিলে।” তখন দেওয়ানজি করিলেন, আপনি অকারণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন। কালেক্টর সাহেব নিলাম করিয়াছেন, করুন; গোলাম দখল দিবে না। সেইরূপ, খুড় ভুলিয়াছেন বলিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোকে ফয়তা দিলেও, খুড় দখল দিবেন না”, (আবার অতি অল্প হইল)

“পয়সার জন্য মানুষ না করিতে পারে, এমন কর্মই নাই। দেখুন, চুরি, ডাকাইতি, গলায় ছুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, জাল সাক্ষী, জাল দলিল, জাল মোকদ্দমা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি এ দেশের লোকের অপের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি, যে পরিমাণে সাধুসমাজে বাহাদুর বলিয়া, গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন।”

(ব্রজবিলাস)

“এক বড় মানুষের কতগুলি উমেদার ছিল। আহার প্রস্তুত হইলে, বাবু, পার্শ্ববর্তী গৃহে গিয়ে আহার করিতে বসিলেন। উমেদারেরাও সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া বাবুর আহার দেখিতে লাগিলেন। নূতন পটোল উঠিয়াছে; পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে। বাবু দুই চারি-খান পটোল খাইয়া বলিলেন পটোল অতি জঘন্য তরকারি; ঝোলে দিয়া, ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, উমেদারেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কি অন্যায়! আপনার ঝোলে পটোল!! পটোল ত ভদ্রলোকের খাদ্য নয়। কিন্তু ঝোলে যতগুলো পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোল তরকারি বড় মন্দ নয়। তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, সুজায় দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপায়ে হয়, বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু করিলেন, তোমরা-ত বেশ লোক, যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে; যেই আমি বলিলাম; প টোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয় আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই, উমেদার আপনার; আপনি যাহাতে খুশি থাকেন, তাহাই আমাদের সর্ব প্রযত্নে কর্তব্য। এই উত্তর শুনিয়া, বাবু নিরুত্তর হইলেন।”

(ব্রজবিলাস)

“এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া কাতের চোখে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্বস্ব লইয়া যাইবেক; ছেলেওলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আর হাবি, তুই সে জনো ভাবিস্ কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, আমাকে বুঝায়।” (রত্নপরীক্ষা)

“আমি ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলা সংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময় লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না।” (রত্নপরীক্ষা)

এইভাবে প্রতিপক্ষকে গোরুর সঙ্গে তুলনা করা, উচ্চাঙ্গের রসিকতার পরিচায়ক। ধন্য, ধন্য বিদ্যাসাগর! আপনি শুধু ব্যাকরণ কৌমুদী বা বর্ণপরিচয়ের লেখক নন, আপনি রসসাগর বিদ্যাসাগর। [ক্রমশঃ]

কোভিড-১৯ - কেন বেশি ঝামেলা এবং আমাদের করণীয় কী ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

সারা বছরই আমরা চিকিৎসকরা ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা করি। সাধারণ মানুষ একে সিজন চেন্স রোগ নামে বলে। এ বছর কোভিড-১৯ নামে যে নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা এসেছে তা একটু বেয়াড়া ধরনের। সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হলে আমরা বলি ওষুধ না খেলে সাত দিনে সারে, আর ওষুধ খেলে এক সপ্তাহে সারে। অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যে রোগটা দেহের নিয়মেই ভাল হয়ে যায়। কিন্তু

কোভিড-১৯ ভাইরাস কার শরীরে কতটা প্রভাব ফেলবে একদম বলা যাচ্ছে না।

এই ভাইরাস নাক মুখ থেকে গলা দিয়ে ঢুকে প্রধানতঃ ফুসফুসের ভিতরের কোষগুলোতে ক্ষতি করে। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলোর মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করে। কিছু ব্যক্তির শরীরে এই প্রদাহ প্রচণ্ড পরিমাণে হয়। সেটা হয় শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমের সাইটোকাইনের বেশি মাত্রায় ক্রিয়ার ফলে। ইমিউনিটি সিস্টেম ভাইরাস মারার জন্যই কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রথম ধাপে ভাল কাজ না হলে হু হু করে সাইটোকাইন আছড়ে পড়তে থাকে। এই ‘সাইটোকাইন ঝড়’ হল বাড়াবাড়ি ক্রিয়া যাকে আমরা বলতে পারি ‘ডেকে আনতে বলায়, কান ধরে টেনে আনা’। শরীরের নিজস্ব সাইটোকাইনের কাজের জন্য এটা ঘটে। এ যেন অনেকটা বেশি ভাল করতে গিয়ে বিপত্তি ডেকে আনা। অটোইমিউন রোগেও দেহের নিজস্ব ইমিউন সিস্টেম নিজের শরীরের প্রোটিনকে চিনতে ভুল করে, যার ফলে নানা রকমের রোগের সৃষ্টি হয় - যেমন ডায়াবেটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বাদুর থেকেই কোভিড এসেছে। বাদুড়ের শরীরে সাইটোকাইনের সক্রিয়তা কম, তাই বাদুড় কোভিড সহ বহু ভাইরাসের আশ্রয়দাতা হলেও তাদের এইসব সমস্যা হয় না। তারা ভাইরাসের আক্রমণে কাবু না হয়ে বেঁচে যায় অন্য আরেক উপায়ে। ‘সাইটোকাইন ঝড়’-এর জন্য অতিরিক্ত প্রদাহের ফলে ভাইরাস এবং আক্রান্ত কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, ফুসফুসের রক্তনালীগুলোর ভিতরটা ফুলে যায়, রক্ত চলাচলের জায়গা থাকে না। তার দরুণ অক্সিজেন দিলেও তা রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারে না। অক্সিজেনের অভাবে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। সাধারণতঃ যাকে জীবাণুঘটিত নিউমোনিয়া বলা হয়, কোভিডে সেই ধরনের নিউমোনিয়া হয় না।

কার শরীরে সাইকাইনের বাড়াবাড়ি প্রতিক্রিয়া হবে তা অনুমান করা যায় না। তাই ৮০ বছরের মানুষ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, আবার ৩৮ বছরের দেবদত্তা মারা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে গবেষণায় হয়ত জানা যাবে কাদের মধ্যে এই বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তখন তাদের ক্ষেত্রে আগেভাগে সাবধানতা নেওয়া সম্ভব হবে।

কোভিডের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। কিন্তু দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বেশি থাকে তাহলে বেশিদূর অগ্রসর হবার আগেই ভাইরাসকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। এটা যে কোন রকম জীবাণু আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের নাকে, মুখে অজস্র জীবাণু সব সময় থাকে, তাই বলে কি আমরা রোজ জীবাণুঘটিত রোগে ভুগছি? গলার মধ্যকার টনসিল এবং অন্যান্য লিম্ফনোড এসব জীবাণুকে বেশি নীচে নামতে দেয় না। তা সত্ত্বেও যখন জীবাণু আক্রমণ করতে সক্ষম হয় তখন প্রথমে আমরা জ্বর অনুভব করি। এই জ্বর হল দেহের আত্মরক্ষাকারী যুদ্ধ ঘোষণা, অর্থাৎ দেহ নিজের তাপমাত্রা বাড়িয়ে নেয় যাতে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। তাই, একটু গলা ব্যথা সর্দিজ্বর শুরু হলেই প্রথম ৪৮ ঘণ্টা ধরে এক দু-ঘণ্টা অন্তর সহ্য করার মতন গরম জল এক ১০-১৫ মিনিট ধরে চুমুক দিয়ে খেলে শরীরের তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। তখন শরীরে ঘাম হবে। ঘাম হলে বুঝতে হবে তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি বেড়েছে। এই বর্ধিত তাপমাত্রায় দেহের রোগ-বিরোধী ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়ে জীবাণুকে মেরে ফেলে। প্রথমেই গরম জল খাওয়া শুরু করলে রোগটার প্রকোপ বেশি হতে পারবে না। লাল বা রক্ত পরীক্ষায় রোগ যখন ধরা পড়বে তখন প্রায় ৭-১০ দিন কেটে গেছে। ইতোমধ্যে বা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। তাই সামান্য একটু জ্বর

কাশি অনুভব করলেই, অথবা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় গেলে ২-৩ দিন টানা গরম জল খাওয়া চালু রাখতে হবে দেহের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য। পশু জগতে দেখা যায় অসুখ হলে তারা চড়া রোদে গুয়ে থাকে যাতে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এভাবেই তারা সেরে ওঠে। অনেক চিকিৎসক সাধারণ সর্দিজ্বরে এভাবেই সফলভাবে চিকিৎসা করেন। আইসক্রিম খেলে ঠাণ্ডায় মুখ ও গলার জীবাণু আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। এক দু-দিন পরেই গলা ব্যথা জ্বর শুরু হয়। তাই অনুষ্ঠানবাড়িতে আইসক্রিম খেয়ে আসার পরে এক গ্রাস গরম জল খেয়ে নিলে জীবাণু আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, ঘরোয়া চিকিৎসা (বা আয়ুর্বেদ মতে) হিসাবে যে উষ্ণ সিরাপ খেতে বলা হচ্ছে, তাও খুব কার্যকরী। এই হালকা গরম সিরাপ একাধারে গলায় তাপ দেয়, আর আদা, দারচিনি, গোলমরিচ, তুলসীপাতা ইত্যাদির দ্রব্যগুণ শরীরের শ্বাসতন্ত্রকে সতেজ রাখে যাতে সহজে কাবু না হয়ে পড়ে। এগুলো হল স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিন ও ভারতের মানুষের কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতা।

তৃতীয়ত, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী রাখার জন্য কয়েকটি পদার্থের প্রয়োজন। সেগুলো হল আয়রন, জিঙ্ক, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই ইত্যাদি। এইসব পদার্থ দৈনন্দিন জীবনে সুষম খাবারের মধ্যেই থাকে। কিন্তু নানা কারণে বর্তমানে আমরা সব সময় সুষম খাদ্য খেতে পারি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই এসব পদার্থ সচেতনভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। আয়রন থাকে আপেল, মোচা, কাঁচকলা, গুড়ে। জিঙ্ক থাকে পেপে আর তরমুজের বীজে

(তরমুজের বীজ চারমগজ নামে মুদি দোকানে বিক্রি হয়)। অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় অঙ্কুরিত ছোলা বা অন্য দানা-য়। ভিটামিন সি-র জন্য প্রতিদিন একটা করে টটকা পাতিলেবুর সরবৎ। Zn-20 সিরাপ রোজ ৫ মিলি, ভিটামিন ডি প্রতি সপ্তাহে একবার ৬০,০০০ আই ইউ। সবুজ শাকসব্জি, টম্যাটো, ফল, গুড় (চিনি একদম নয়) ইত্যাদি খাবারগুলোও খুব কাজে আসবে। কিছু চিকিৎসক প্রতিদিন সকালে এবং রাতে এক কোয়া রসুন খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

চতুর্থত, প্রতিদিন অন্তত হালকা ব্যায়াম করতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামও গুরুত্বপূর্ণ। শ্বাস নিয়ে ১০-১৫ সেকেন্ড ধরে রাখা এটা অভ্যাস করতে হবে।

এছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে বেসব সচেতনতা পালন করার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই মানতে হবে।

আশপাশের চালচিত্র

গত ১৮ জুলাই ২০২০, শনিবার দুপুর বারোটায় পুরসভার ১০২ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি একটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী সভাপতি মণীন্দ্রনাথ বাগ ও পুরসভার কো-অর্ডিনেটর রিঙ্কু নস্কর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭১৭ সালে মোগল সম্রাট ফারকসিয়রের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর সহ কলকাতার আরো সাঁইত্রিশ-আটত্রিশটি গ্রাম কেনার অধিকার এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের সনদ লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এবং ইংরেজদের কাজ থেকে নাগরিক সুবিধা পাবার জন্য বহু মানুষ কলকাতায় জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন।

অপরিকল্পিত জনবসতি গড়ে ওঠার বহুজনের সমাগমের শহর ক্রমশঃই বিজি, রাস্তাঘাট অপরিকল্পিত হওয়ায় শহরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। একারণে ১৮৭৬ সালে সরকারি নির্দেশমতো গঠিত হয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কলকাতার জনসমাগমের চাপ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। নানাবিধ বিধি পরিবর্তন করতে করতে আজ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নগরায়ন সহ নগরবাসীদের জন্য নানাবিধের কাজ করে থাকে। এই কাজ মূলত দু ধরনের— বাধ্যতামূলক ও স্বৈচ্ছাধীন।

পুরসভা পরিচালনা করার জন্য প্রথমদিকে করদাতাদের ভোটে পুর নির্বাচন হতো। পরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে পুরসভা গঠিত হয় এবং মেয়রের নেতৃত্বে পুরসভা পরিচালিত হয়। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার বিস্তৃতি ২০৬.১৮ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশী অঞ্চল। তার জন্য ১৪৪টি ওয়ার্ডের ১৪৪ জন পুরপ্রতিনিধি বিভিন্ন দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার আগে-পরে বহু স্বদেশপ্রেমিক লেখকগণ নেতৃত্বা মেয়র হিসেবে পুরসভা পরিচালনা করেছেন। যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৯২৪), লেখক রবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত (১৯২৫), নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু (১৯৩০), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৩১), আবুল কালাম আজাদ (১৯৩৫), ডাঃ ত্রিভুজা সেন (১৯৫৭) প্রমুখ।

পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে সম্বর্ধিত হয়েছেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ-ই মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

এতসব কর্মকাণ্ডে পুরসভার মূল কার্যনির্বাহী লোকেরা কিন্তু চিরকালই ব্রাত্য। এরা রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'য় বিবেকানন্দের লেখায় (মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই), বা মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনে বারবার উল্লিখিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এদের নিয়েই লিখেছেন 'মেথর' কবিতা। সমাজের দুর্বল, অবহেলিত মানুষদের নিয়ে লিখেছেন প্রগতি ভাবনার কবিতা। 'মেথর' তেমন একটি কবিতা। তিনি লিখলেন—

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদ্য তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

২০২০ সালে নাগরিক জীবন নানাভাবে আলোকিত হলেও পুরসভার নিম্নবর্গীয় কর্মচারী শুধুই কর্তব্যকর্ম করেন বেতনের বিনিময়ে। তাদের একটু সম্মান প্রদান করা, সহানুভূতি নিয়ে পাশে দাঁড়ানো বহু নাগরিকের ভাবনার মধ্যেই নেই। ১০২ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি এই কর্তব্য পালন করেছেন আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে। আয়োজন সামান্য কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল হৃদয়ভরা। এই অঞ্চলের মোট ১৯২ জন কর্মচারী যারা করোনা অতিমারী সংক্রমণকে উপেক্ষা করে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন, আমফান ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকাকে দিনরাত এক করে নাগরিকদের চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন, তারা অবশ্যই নাগরিকদের কুর্নিশ পাবার যোগ্য। এদিন তারা অভিনন্দন জানিয়ে প্রত্যেকের হাতে দিয়েছেন পুষ্পদণ্ডিকা, মাস্ক এবং এক কৌটো রসগোল্লা।

১৮ জুলাই, শুনিবার, দুপুর বারোটাই
এক নতুন ইতিহাসের জন্মলগ্ন।

- বিজ্ঞপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,

যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা

১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক)

এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)

প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শ্রী এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট)

বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জী এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যা ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।